পথের পাঁচালি এবং পথের পাঁচালি

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতি দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমতী বিজয়া রায়ের আত্মজীবনী আমাদের কথা প্রকাশিত হয়ে গেল। সত্যজিৎ রায়ের স্বপ্ন ও সাধনার অনেক তথ্য লেখিকার দিনলিপির মধ্যে রাখা ছিল। এখন তা সর্বসাধারণেব সম্পত্তি হল। এ ছাড়াও গত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সত্যজিৎ ও তাঁর পরিচিত জনের নানা সাক্ষাৎকার, এবং তাঁর বিষয়ে নানা বই ও প্রবন্ধের বিবরনে পথের পাঁচালি চলচ্চিত্র রচনার সমগ্র ইতিকথা এখন সুবিদিত। তবু বর্তমান আলোচনায় ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে তার চুম্বকটুকু প্রথমে স্মরণ করে নেওয়া যাক।

সত্যজিৎ রায় কর্মজীবন শু করেছিলেন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে। কিন্তু ফিল্ম তৈরির বাসনা তাঁর বরাবরই ছিল। তাই বিখ্যাত ফরাসী চিত্রপরিচালক জাঁ রেনোয়া তাঁর রিভার ছবি তোলবার জন্য যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন তিনি যেচে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাঁর ইউনিটের সঙ্গে আউটডোরে ঘুরে ঘুরে তাঁর ছবি তোলার প্রনালী শিখে নেন। এই সময় একদিন পথের পাঁচালির কিশোর সংস্করণ আম আঁটির ভেঁপুর মলাট তৈরি করতে গিয়ে তিনি নতুন করে পথের পাঁচালি পড়েন এবং মনে মনে স্থির করেন যে এই বই নিয়েই তিনি ছবি তৈরি করবেন। অনেক অসুবিধা কাটিয়ে সে ছবি তৈরি হলে পর দেখা গেল এর দ্বারা ভারতীয় চলচ্চিত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এখন থেকে চলচ্চিত্র সাবালক হল। সে লিখিত সাহিত্য বা মঞ্চ নাটকের ছত্রছায়ায় না থেকে এবার নিজের ভাষায় কথা বলবে। এইটাই পথের পাঁচালি চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক গুত্ব, এবং এইজন্যই এ বছর তার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে।

সত্যজিৎ রায় যখন এ ছবির পরিকল্পনা করছিলেন সেটা বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সুসময়। ছবির বাজার যথেষ্ট ভালো। কিন্তু তা হলেও তখনকার বেশিরভাগ জনপ্রিয় ছবি যেমনটি হতো সেটা তাঁর পছন্দ ছিল না। গতানুগতিক গল্প, চড়া দাগের সেন্টিমেন্ট, কলাকৌশলে থিয়েটারি ভঙ্গী এবং আউটডোরের বদলে স্টুডিওর ভেতরে বানানো দৃশ্যপট, এসব তাঁর কৃত্রিম বলে মনে হত। বিদেশের বহু ফিল্ম দেখে তাঁর চি তৈরি হয়েছিল বলে তিনি প্রথম থেকেই জেনেছিলেন সিনেমার আলাদা লক্ষণগুলি কি। সাহিত্য ও মঞ্চনাটকের তুলনায় কোথায় তার শক্তি, আর কোথায় তার সীমাবদ্ধতা এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারনা ছিল। সে ধারনা তিনি কাজে প্রয়োগ করে দেখাতে চাইছিলেন। তাই ফিল্ম তৈরির পর দেখা গেল বিভূতিভূষনের পথের পাঁচালি এবং সত্যজিতের পথের পাঁচালি এক নয়। একটা দিয়ে অন্যটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে ভুল হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গত পঞ্চাশ বছর ধরে সেই ভুলটাই চালু আছে। দেশে বিদেশে আপামর জনসাধারন, বিশেষত যাঁরা তেমনভাবে পথের পাঁচালি পড়েননি, ফিল্ম দিয়ে বইটার বিচার করেন। তাঁরা বিভূতিভূষনকে ভুল বোঝেন। আবার প্রমথনাথ বিশির মত মনস্বী সমালোচকও বই এর মানদণ্ডে ফিল্মের বিচার করে দুঃখ পান (বিভূতি রচনাবলী ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ ভূমিকা), তাঁর মনে হয় সত্যজিৎ রায় দেশের দারিদ্র্য দেখিয়ে বিদেশিদের বাহবা পেলেন, কিন্তু সে দারিদ্র্যের তলায় যে অমৃতের উৎস ছিল সেটিকে দেখালেন না। আজ যখন ফিল্মের পঞ্চাশ বছর এবং উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর পার হয়ে গিয়েছে তখন একবার পিছন ফিরে দেখা যেতেই পারে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে কে কি বলতে চেয়েছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২রা মে কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারে যখন সত্যজিৎ রায়ের জন্ম হল বিভূতিভূষন তখন সাতাশ বছরের এক অখ্যাত যুবক, হরিনাভির স্কুলে অস্থায়ী সহকারী শিক্ষকের কাজ পেয়েছেন, তাও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সুপা

রিশে। ইতিমধ্যেই তাঁর জীবনে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে - চিরসঙ্গী দারিদ্র্য তো আছেই, তার ওপর শৈশবে পিতা ও যৌবনে স্ত্রীর মৃত্যুশোক সইতে হয়েছে। সাংসারিক দায়িত্বও অনেক। লেখক হবার কোনো সচেতন পরিকল্পনা হয়ত তখন তঁার ছিল না। অপরের অনুরোধে এবং খানিকটা খেয়ালবশে কলাকৌশলবর্জিত দু তিনটি সাদামাটাছোটগল্প তিনি লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তার পরিনাম আদৌ ভাল হয় নি, গল্পবর্ণিত কোনো নারীচরিত্রে চেনাশোনা একজন পল্লীবধূর সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে বদনাম দিয়ে বিদায় করলেন। এ ঘটনার অব্যবহিত পরে, যখন তিনি পাথুরিয়াঘাটার খেলাত চন্দ্র ঘোষের বাড়িতে গৃহশিক্ষকতার কাজ করছিলেন তখন একটা ঘটনায় তাঁর সারা জীবনের ধারা পালটে গেল। ভাগলপুরে ঘোষেদের একটা বিরাট জঙ্গলমহাল ছিল। সেখানকার ম্যানেজার কিছুদিন ধরে একজন বিশ্বস্ত সহকারী চাইছিলেন। বন জঙ্গলে আগ্রহ আছে দেখে বিভূতিভূষনকে তাঁরা ঐ কাজের প্রস্তাব দেন, এবং তিনি সাগ্রহে তাতে রাজি হন। সেখানে নির্জন প্রবাসে আপন শৈশবকালকে ভিত্তি করে প্রায় তিন বছর ধরে, মধ্যে পাণ্ডুলিপি পরিবর্তন করে, ধীরে ধীরে তিনি পথের পাঁচালি উপন্যাসটি লিখেছিলেন। শেষ হলে পর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বিচিত্রা পত্রিকায় পনেরো কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশিত হয়, এবং তখনই তার অভিনবত্বের গুনে গুনীজনের দৃষ্টি আকর্ষন করে। পরে বই আকারে প্রকাশ হলে দেখা গেল বাংলা সাহিত্যে এক নতুন জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েছে। বিভূতি ভূষনের দ্বিতীয় বই অপরাজিত পথেব পঁাচালিরই সম্প্রসারণ।

এই দুখানি বই নিয়ে সত্যজিৎ রায় তিনটি ছবি করেছেন--- পথের পাঁচালি, অপরাজিত, এবং অপুর সংসার। স্বভাবতই বিভূতিভূষনের বিভাগ অনুসারে তিনি চলেন নি। প্রথমে পথের পাঁচালিকেই ধরা যাক। এ উপন্যাস তিন খণ্ডে বিভক্ত-- বল্লালি বালাই, আম আঁটির ভেঁপু এবং অক্রুর সংবাদ। বল্লালি বালাই নামকরন ইন্দির ঠাকনকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছে, কারন তিনি বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথার বলি। ইন্দির ঠাকনের মৃত্যুতে ঐ খণ্ডের শেষ হয়েছে। তখন অপু সদ্যোজাত শিশু এবং দুর্গা নিতান্তই বালিকা। দ্বিতীয় খণ্ড আম আঁটির ভেঁপু অবলম্বনে সত্যজিৎ তাঁর ছবিটি তুলেছেন। দুর্গার মৃত্যু এবং হরিহরের সপরিবারে নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে কাশী চলে যাওয়া পর্যন্ত ঘটনা এই খণ্ডে আছে। এর সঙ্গে বল্লালি বালাই থেকে ইন্দির ঠাকনের অংশটুকু মাত্র সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে নিয়ে এসেছেন। তৃতীয় খণ্ড অক্রুর সংবাদ অবলম্বনে তৈরি হয়েছে তাঁর অপরাজিত ছবির প্রথম অংশ, যেখানে হরিহরের কাশীর সংসারজীবন ও মৃত্যুর বিবরন পাই।

উপন্যাসের যে বিভাগ বিভূতিভূষন করেছিলেন সেখানে তাঁর একটি নিজস্ব পরিকল্পনা কাজ করেছিল। বল্লালি বালাই হল গ্রন্থভূমিকা। এখানে তিনি একটি গ্রামকে আসরে এনেছেন যেখানে পুরনো কাল যাই যাই করেও এখনো একেবারে চলে যায় নি, "শাঁখারিপুকুরে নালফুলের বংশের পর কত বংশ আসিয়াছে, চলিয়া গিয়োছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল, এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটার নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলোক চক্রবর্তী ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢে উয়ের ফেনার মত গ্রামের নীলকুঠির কত জনসন টমসন কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।" (পথের পাঁচালি ১ম পরিচ্ছদ)

এইখানে আবির্ভাব হবে তাঁর নায়কের, যার নাম অপু। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে বড় হবে। গ্রামের জীবনে বাঁধা পড়ে থাকবে না। এখান থেকে দূরে চলে গিয়ে সে উপলব্ধি করবে এখানকার মূল্য । তার জীবনে অনেক শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, বঞ্চনা আসবে, আসবে প্রেম ও আনন্দ। মাঝে মাঝে এমন হবে যে সে ভুলে যাবে নিজেকে, মনে হবে সে বুঝি স্থুল জীবনের তুচ্ছতায় নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সবই কাটিয়ে উঠবে, নিজের কাছে হয়ে থাকবে অপরাজিত। দুঃখের আগুনে শুদ্ধ হবে তার শিল্পিমন, সে বড় লেখক হয়ে উঠবে, তার লেখার ভেতরে থাকবে তার শৈশব যৌবনের পথ চলার কাহিনী। শেষে নিজের উৎসস্থল নিশ্চিন্দিপুরে সে ফিরে আসবে তার বালক সন্তানকে নিয়ে, তাকে দ্বিতীয় অপু হয়ে ওঠার সুযোগ দিতে। সে নিজে চলে যাবে দূর পৃথিবীর পথে পথে জীবনের নব নব বিকাশের সন্ধানে। এই ভাবে কালের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে। এই কাহিনী অপুর, এবং কতকাংশে লেখকের নিজেরও বটে, পথের পাঁচালি ও অপরাজিত এই

দুই খণ্ডে বিধৃত এটি এক এপিক উপন্যাস। পথের পাঁচালিতে অপুর প্রস্তুতিপর্ব, তখন সে শিশু ও বালক, গুজনের স্নেহছায় ায় লালিত। অপরাজিত তে সে বয় সন্ধিতে পৌঁচেছে। তখন তার কানে এসেছে বাইরের জগতের ডাক। সর্বজয়ার স্নেহ এবং নিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতছানি উপেক্ষা করে সে কলকাতার কলেজে পড়তে চলে গেছে।

অপারাজিত এবং অপুর সংসার এই দুই চলচিচত্রে আমরা এই অপুর খানিকটা পাই বটে, কিন্তু পুরোটা কখনোই নয়, সত্যজিতের অপু বিভূতিভূষনের তৈরি অপুর মত নরম স্বভাবের যুবক নয়। তার প্রকৃতি আরও কঠিন ধাতুতে গড়া , ব্যবহ ারে ক্ষ হতে তার বাধে না, তার সুখ দুঃখের প্রত্রিত্রিয়াগুলি অনেক তীক্ষ্ণ । তা ছাড়া যে প্রকৃতিমুগ্ধতা অপুর স্বভাবের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এখানে তা অনুপস্থিত। এই অপুও নিসর্গ ভালবাসে এবং সবরকম বদ্ধতা থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু সেটা তা জীবনের সবখানি নয় । এই অপুর জীবনে লীলা আসে নি, বাল্যপ্রেমের যে অমৃত অপুর জীবনের একটা বড় সম্পদ ছিল এখানে তার উল্লেখ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, এই অপুর জীবন কোনও শিল্পির ভিতর থেকে হয়ে ওঠার কাহিনী নয়। এই অপু সত্যজিতের নিজস্ব জীবনবোধ দিয়ে তৈরি, হয়ত বা তাঁরই সমকালীন কোনো যুবক, যে নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে শুধুই জীবনের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই এই অপু শেষে নিশ্চিন্দিপুর ফিরে আসে না, লেখক হবার ইচ্ছাও তার নেই। বরং নিজের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলে সে দেশে ফিরে আসে নিজের ছেলেকে নিয়ে যাবার জন্য।

যাই হোক আপাতত এই প্রসঙ্গ মুলতুবি থাক। আমরা ফিরে যাই পথের পাঁচালির কথায়। পথের পাঁচালি চলচিচত্রে অপুর ভূমিকাই তুলমামূলকভাবে প্রচ্ছন্ন। দুর্গা, সর্বজয়া, হরিহর, ইন্দির ঠাকন সকলেই তার চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত।একেব ারে শেষে দুর্গার চুরি করা সোনার কোটোটি ফিরে পেয়ে সেটা নিঃশব্দে ডোবার জলে ফেলে দেবার ঘটনাটি ছাড়া আর কোথাও অপুকে আলাদা করে আমরা লক্ষ্য করি না। আর সকলের মত, এবং গ্রামের পথ ঘাট, ঋতুবৈচিত্র্য, উৎসব ও দ ারিদ্র্য পীড়িত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সেও একটা অংশমাত্র, তার বেশি কিছু নয়, নয়, তার কারন পথের পাঁচালি পর্বে অপু সত্যজিৎ রায়ের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল না। তিনি যা করতে চাইছিলেন তাঁর নিজের কথাতেই সেটা এইরকম----
"মানবিকতা, কাব্যগুণ এবং সত্যনিষ্ঠা - এই যে গুনগুলি পথেব পাঁচালিকে মহৎ সাহিত্য কৃতিত্বে উন্নীত করেছে তার জন্যই আমি এই উপন্যাসটিকে নির্বাচিত করেছিলাম। আমি জানতাম এই বইখানির চেহারায় আমাকে অনেক বর্জন ও পরিবর্তন করতে হবে। একথা নিশ্চিত যে হরিহর পরিবারের কাশী গমনের বেশি আমার ছবিতে ধরানো সম্ভব হবে না, তবু একথা আ মি বুঝেছিলাম যে এই বইকে নীরস কাটা ছাঁটা ঘটনাপঞ্জীর ছাঁচে ঢালাই করা মারাত্মক ভুল হবে । চিত্রনাট্যের মধ্যে উপন্যাসের অবিন্যস্ত ভাবের কিছুটা অন্তত রাখা দরকার, কারন তারই মধ্যে একটা বাস্তব নিহিত রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রাম জীবনে একটা অবিন্যস্ত ছন্নছাড়া ভাবরূপ, ছন্দ, গতি ইত্যাদি বিষয়ে এই পর্যায়ে আমাকে তেমন চিহিত করে নি। স্বা মি, স্ত্রী, শিশুসন্তান এবং বুড়ি পিসিমাকে নিয়ে এই পরিবারের সৃষ্টিকেন্দ্রটি আমি পেয়ে গিয়েছি। চরিত্রগুলোই লেখকের দ্ব ারা এমনভাবে কল্পিত হয়েছিল যে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা অন্ত শীল সম্পর্ক গতিশীল হয়ে উঠেছিল, একবছর আ মি সময় পেয়েছিলাম, চিত্রগত এবং আবেগ গত দারিদ্র্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য , অশ্রু এবং আনন্দ, গ্রামের নৈসর্গিক শোভা এবং তার অকন দারিদ্য --- এই সমস্ত বৈপরীত্য গুলো ও আমার কাছে ধরা দিয়েছিল। সর্বশেষে কাহিনীর দুটি অর্থপূর্ণ মৃত্যুর দ্বারা গল্পের দুই অধ্যায়কে চিহিত করতে পেরেছিলাম। একজন চিত্রনাট্য কারের কাছে এর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কি বা থ াকতে পারে" (সিনেমায় পথের পাঁচালির পাঁচ দশক অমিয় সান্যাল।)

দক্ষিণ চবিবশ পরগনার বোড়াল গ্রামে পথের পাঁচালির শুটিং হয়েছিল। ঐ গ্রামের যে আলাদা রকম কোনো নৈসর্গিক শোভা ছিল তা নয়। উপন্যাসবর্ণিত নিশ্চিন্দিপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখানো সত্যিজিতের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন একটি সত্যিকারের গ্রাম যেখানে তিনি অব্যাঘাতে কাজ করতে পারবেন, সত্যিকারের গ্রামবাসীর মততাঁর কুশীলবদের মেকআপহীন চেহারা, গ্রামের ভাঙা ভিটে, পথ, ঘাট, বাঁশবন, গুমশায়, ফেরিওলা, যাত্রা ও পালপার্বন ত াদের স্বাভাবিকত্বের জন্যই আশর্চ্য ছিল। খুব যত্ন নিয়ে সত্যজিত এখানে প্রতিটি মূহূর্ত তৈরি করেছিলেন। মেঘ বৃষ্টি রোদের আসা যাওয়া দেখাবার জন্য তিনি প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছেন, সুবিধার খাতিরে কিছু বা

নিয়ে নিতে যান নি। আসন্ন বৃষ্টির মূহূর্তে জলজ ফড়িং এর পাখার কাঁপন, পদ্মপাতায় জলের প্রথম ফোঁটা, আকাশ ভেঙে নামা বৃষ্টিতে গাছের তলায় জড়সড় দুই ভাইবোন, দিগন্তবিস্তৃত কাশবনের মধ্য দিয়েতাদের ছুটে গিয়ে রেলগাড়ি দেখা, নারকেল গাছের কম্পমান পাতা থেকে চাঁদের আলোর ঝরে পড়া - সেকালের সাধারন ক্যামেরার সাদা কালো ছবিতেও যে অপার্থিব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে তা তুলনাহীন। স্বাধীনতার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনসংখ্যার চাপে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের যে পুরনো চেহারা আজ আর নেই, এবং তখনই যা দ্রুতবিলীয়মান, একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবার আগে সত্যজিৎ সেটা ক্যামেরা বন্দী করে রেখে দিলেন ভাবীকালের জন্য। এই পটভূমিতে যে মানুষেরা যাওয়া আসা করছে, তাদের চেহারা ও চরিত্র, তাদের পরস্পরের মধ্যেকার বহুমুখী সম্পর্ক, তাদের কণ স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, অমর আশায় বেঁচে থাকার চেষ্টা, এ সবের বিস্ময়কর বাস্তবতা আমাদের মনকে ধাক্কা দিয়েজাগিয়ে দেয়। ছবি দেখতে দেখতে আমরা ক্রমশ ডুবে যাই দেশকালের সীমানা দিয়ে ঘেরা একটা ছোট ভূখণ্ডে,যা ছবি হয়েও বাস্তবের চেয়ে বেশি সত্য।
কিন্তু এই গ্রাম সত্যজিৎ রায়ের আবিষ্কার, এটি বিভূতিভূষনের নিশ্চিন্দিপুর নয়।

বিভূতিভূষনকে এমনিতে ঢিলেঢালা অগোছালো লোক বলে মনে হলেও তাঁর আন্তর্জীবনের ইতিহাস কিন্তু সে কথা বলে না। অন্তত নিজের জীবনটা নিয়ে তিনি কি করতে চান এবং কি চান না সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি বুঝেছিলেন পাকা বিষয়বুদ্ধি, বাঁধা চাকরি, গড়পড়তা বাঙ্গালীর আচরিত জীবন তাঁর জন্য নয়। ভাগলপুরের জঙ্গলমহালে বসে পথের পাঁচালির খসড়া লিখতে লিখতেই তিনি অনুভব করেছিলেন লেখক হওয়াই তাঁর ভবিতব্য। বাংলা সাহিত্যের লেখালিখির আসর তখন নানা মত ও পথের কোলাহলে সরগরম। প্রথম মহাযুদ্ধেপর ইউরোপ থেকে এসেছে বাস্তববাদের নতুন হাওয়া। কল্লোল কালিকলম গোষ্ঠী সে হাওয়ায় গা ভাসিয়েছে। কেউ মার্কস্, কেউ ফ্রয়েড, কেউ বা দুজনের মধ্যেই খুঁজে নিতে চাইছেন নিজেদের অভীষ্টকে। তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদধবনি শোনা যাচ্ছে। তণ আই সি এস অন্নদাশংকর রায় পথে প্রবাসে লিখে চারদিকে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। এদিকে প্রবীনেরাও তখন পর্যন্ত সমান সক্রিয়। যে সময়টায় বিচিত্রায় পথের পাঁচালি বেরোছিল তখন ঐ পত্রিকাতেইএকসঙ্গে বেরোছিল রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ এবং শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব। এই সোরগোলের মাঝখানে খুব নিঃশব্দে বিভূতিভূষন প্রবেশ করেছিলেন। নিজের প্রথম উপন্যাসে নায়ক রূপে থাকে বা যাঁদের তিনি আসরে নামালেন তাঁরা সমকালের বার্তাবাহী কোনও উদভ্রান্ত বা বিদ্রোহী বা বিক্ষুব্ধ যুবক নয়, নয় কোনও বোহেমিয়ান প্রেমিক।এরা দুটি গ্রাম্য শিশু। এই কৌশল বিস্ময় কর, কারন জগতে শিশুর মত একাধারে নূতন ও পুরাতন আর কেই বা আছে ? নিশ্চিন্দিপুরে তাদের হতদরিদ্র সংসারে বাপ মা স্বচ্ছল সংসারের স্বপ্ন দেখে, আর জ্ঞান হবার কিছু পর থেকেই বালক অপু দেখে অন্যরকম স্বপ্ন "এই ছায়া ভরা বৈকালটিতে নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ রকম লতাপাতার মধুর গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে করে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোনো অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না -- একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন। (পথের পাঁচালি ১৬ পরিচ্ছেদ) এই গ্রামের নাম নিশ্চিন্দিপুর, কারন অপুর এখানে নিশ্চিন্ত জীবন। অপুর ভালো নাম অপূর্ব কুমার, জগতের সবই তো তারকাছে অপূর্ব দৃষ্ট। এই অপূর্ব বড় হলে নিশ্চিন্দিপুরের সুখস্বর্গ ভেঙে যায়, পথের দেবতা তাকে কত না ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। তার পরে পরিণত যৌবনে সে বই লেখে---

"দুঃখের নিশীথে তাহার প্রানের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে--- তা সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে, জীবনকে সে কি ভাবে দেখিল তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে। "
"কাদের কথা বইয়ে লেখা থাকিবে? কত লোকের কথা। গরীবদের কথা। ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না। ... পথে ঘাটে হাটে, গ্রামে, শহরে, রেলে, কত অদ্ভুত ধরনের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে জীবনে -- কত সাধু সন্ন্যাসী, দোকানি, মাস্টার, ভিখারি, গায়ক, পুতুল নাচওয়ালা, আমপাড়ানি, ফেরিওয়ালা, লেখক, কবি, ছেলেমেয়ে -- এদের কথা।"
"আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হইতে সে নিশ্চিন্দিপুরের পোড়ো ভিটাকে অভিনন্দন পাঠাইল মনে মনে। যখানেই

থাকি, ভুলি নি। যাহাদের বেদনার রঙে তাহার বইখানা রঙিন, কত স্থানে, কত অবস্থায়, তাহাদের সঙ্গে পরিচয়, হয়ত সে জানে না। এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার শান্তির মধ্য দিয়া সে মনে মনে সকলকেই আজ তাহার ধন্যবাদ জানাইতেছে।" (অপরাজিত ২১শ পরিচ্ছেদ)

এ সব কথা অপুর বকলমে স্বয়ং বিভূতিভূষনের কথা। ডায়েরিগুলিতেও এর প্রায় আক্ষরিক প্রতিধবনি আছে। অপুর মত বিভূতিভূষণও পরিনত যৌবনে পথের পাঁচালি এবং অপরাজিত লেখবার সময় বিশ বছরের ব্যবধান থেকে অতীতকে দেখেছিলেন। দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে অনেকখানি দূরত্ব ছিল। মাঝখানে ছিল বিরহী হৃদয়ের একটি স্বচ্ছ পর্দা। ঐ যাদুকরী পর্দার মধ্য দিয়ে নদীর ঘাট, শিমুল গাছ, বাঁশবন, বনধুঁধুলের সারি, রাংচিতের বেড়া, গাছের মাথায় সূর্যাস্তের রাঙা রোদ, ভাঙা ভিটে, ঝুলপড়া কুলুঙ্গি, কড়ি বা খাপরা সবই মধুময় হয়ে ওঠে। বিভূতিভুষনের পথের পাঁচালির ছত্রে ছত্রে এই স্মৃতিবিধুরতা জড়িয়ে আছে।

চলচ্চিত্রে তা নেই, এবং থাকা সম্ভবও নয়। তাছাড়া একটা বই যখন আমরা পড়ি তখন পড়তে পড়তে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিই নিজের অভিজ্ঞতা, মাঝে মাঝে থামি, ইচ্ছা হলে ফিরে পড়ি। এইভাবে ধীরে সুস্থে রসাস্বাদন করবার উউপায় চলচ্চিত্রের নেই। তাকে বলবার কথটা একবারেই বলে নিতে হবে। এইজন্য তার অভিঘাত অনেক প্রবল হওয়া দরকার, যাতে দর্শকের মনের ওপর দিয়ে তা পিছলে না যায়। আবার ভালো সিনেমা তো শুধুই দৃষ্টিনন্দন কয়েকটা স্থিরচিত্র নয়, তা গতিময় জীবনের ব্যাখ্যাও বটে। সেইজন্য ধাবমান দৃশ্যাবলীর মধ্যেই ভরে দিতে হয় চিন্তার উপাদান, ইঙ্গিত ও সঙ্কেত, দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যান্তরের ব্যঞ্জনা। তাছাড়া লেখকের কাজ একার কাজ, কিন্তু ছবি তোলাটা একটা যৌথ প্রয়াস। একজন হয়ত নির্দেশ দেন। কিন্তু কলাকুশলী থাকে অনেক এবং নানা রকমের । তাদের সকলের চিন্তাধারা এবং গুনগত মান নিশ্চয়ই একরকমের হয় না। তাছাড়া পাঠ্য গল্পে, এমন কি নাটকেও যে ধারাবাকিতা থাকে, চলচ্চিত্রে তা থাকে না। সেখানে পরের ঘটনা আগে, আগের ঘটনা পরে, একই দৃশ্যের মাঝখানে অনেক দিনের ব্যাবধান এ সব থাকে। যেমন এখন আমরা সকলেই জানি পথের পাঁচালি ছবির সুটিং করবার সময় সবার আগে তোলা হয়েছিল কাশবনের মধ্য দিয়ে অপু দূর্গার দৌড়ে যাবার দৃশ্যটি। আমরা এও জানি যে অর্থাভবে মাঝখানে দেড় বছর পথেব পাঁচালির কাজ বন্ধ ছিল। এক্ষেত্রে পরের অংশ বেমালুম খাপ খাওয়ানো কত কঠিন তা সহজেই অনুমান করা যায়। সত্যজিৎ কিন্তু কোথাও কোনো খুঁত রাখেন নি। তাঁর চিত্র নাট্যের খসড়া এবং দৃশ্যপরিকল্পনার ছোট ছোট স্কেচ অনেকটাই প্রকাশিত হয়েছে, অন্যান্য অংশও সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। সেখান থেকে পরিস্কার বোঝা যায় তাঁর কার্যপ্রনালী কতখানি নিষ্ঠাপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ছিল। আসলে তাঁর মনশ্চক্ষে পুরো ফিল্মটি আগে তৈরি না হয়ে থাকলে এই ডিটেলের কাজগুলি তিনি করতেই পারতেন না। অভিনেতা এবং কলাকুশলীসহ ছবির পুরো ইউনিট টি যদি একসুরে বাঁধা না হত তাহলেও পথের পাঁচালির মত নতুন ধারার ছবি তোলা যেত না। সত্যজিৎ রায়ের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি শুধু নিপুনভাবে চিত্রনাট্য পরিকল্পনা করেছিলেন তাই নয়। কলাকুশলীদেরও তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম ছবির অভিনেতারা শুধু নন - ক্যামেরাম্যান, শিল্পনির্দেশক, শব্দযন্ত্রী, সুরকার, সম্পাদক প্রভৃতি সকলেই ছিলেন নতুন বা প্রায় নতুন। তার কারণ এটা নয় যে এঁদের কম পয়সায় পাওয়া যাবে। আসল কারন এই যে ছবি তোলা নিয়ে এঁদের কোনও গোঁড়ামি বা বাঁধাধরা পুরনো অভ্যাস গড়ে ওঠে নি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ইউনিট তাঁর কর্মপরিকল্পনায় নিষ্ঠাবান হবে, তাঁর চিত্রভাবনার অংশীদার হবে, এবং তাঁর নির্দেশ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। এমনটি না হলে চারিদিকের বিদ্ধ সমালোচনার মুখে পথের পাঁচালি তোলা যেত না। তাছাড়া পরবর্তী কালের সাক্ষ্যে আরও প্রমানিত হয়েছে যে সত্যজিৎ মানুষ চিনতেন। কাকে দিয়ে কোন কাজ হবে তা তিনি নির্ভু ল বুঝেছিলেন। তাঁর সংগ্রহ করা অভিনেতা অভিনেত্রী ও কলাকুশলীরা অনেকেই পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিপুল প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এবং জগৎ জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু সেদিন তাঁদের ভিতর কার সুপ্ত সম্ভাবনাকে যে লোক আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়।

পথের পাঁচালির ছবি তোলা যখন শু হচ্ছে প্রধান ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্রের বয়স তখন বাইশ বছর। ইতিপূর্বে ক্যামেরার

কাজ শেখবার বাসনায় তিনিও সত্যজিতের মতই রেনোয়ার ছবি তোলবার সময় তাঁর ক্যামেরাম্যান ক্লদ বেনোয়ার পিছন পিছন ঘুরতেন এবং তাঁর কোন শট কিভাবে নেওয়া হচ্ছে, একটা খাতায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরন নোট করে রাখতেন। ঐ খানেই সত্যজিতের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। পরবর্তী বিবরন তাঁর কথাতেই পাচ্ছি--- "মানিকদার প্রত্যেকদিনের শুটি ং দেখার উপায় ছিল না, কিন্তু রেনোয়ার ছবিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানবার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। তাই আমি সময় পেলেই প্র ায় সন্ধ্যাবেলা ওর বাড়ি যেতাম। আমার কাছে শুটিং এর গল্প ডিটেলে শুনতেন, আমার তোলা শুর্টিং এর ছবিগুলো দেখতেন। আমার ছবি তোলার ব্যাপারে তিনি খুব উৎসাহ দিতেন, আর একটি কথা বার বার বলতেন--- তোমার কিন্তু চোখ তৈরি হয়ে গেছে।"

পরে সুব্রত মিত্র যখন পথের পাঁচালির প্রধান ক্যামেরাম্যান হলেন তখন স্বভাবতই সত্যজিতের প্রতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিজের যোগ্যতা প্রমান করবার চ্যালেঞ্জ। তিনি নিজেই সে সময়কার মনোভাবকে বলেছেন"আগুনে ঝাঁপ দেওয়া " -- এরই ফলে সেকেলে ভারী মিচেল ক্যামেরা ঘাড়ে বৃষ্টির মধ্যে ফড়িং এর পিছনে দৌড়ো দৌড়িকরেছেন, আবার দরক ার হলে সেতারও বাজিয়েছেন।
আর্ট ডিরেক্টর বংশী চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সত্যজিতের বন্ধু।
শুভো ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁর অনুপ্রেরনায় তিনি কাশ্মীর থেকে কলকাতায় চলে আসেন। পরে ঘটনাচক্রে যুক্ত হন সিনেমাশিল্পের সঙ্গে এবং আর্ট ডিরেক্টরের কাজ শু করেন। তখনকার সিনেমায় সেট সেটিং এর ব্যাপারটা এত যান্ত্রিক ছিল যে তিনি ঐ কাজ করতে গিয়ে একেবারেই খুশি ছিলেন না। এমন সময় রেনোয়ার ছবিতে অন্যতম সহকারী শিল্পনির্দেশকের কাজ করতে গিয়ে তাঁর চোখ খুলে গেল। তিনি দেখলেন ভালো পরিচালকেরা এই কাজটাকে কতখানি গুত্ব দেন। এক বাস্তবসম্মত ও তাৎপর্যপূর্ণ করবার জন্যে কি কি কৌশল ব্যবহার করেন। সেইসব শিক্ষা তিনি প্রয়োগ করলেন তাঁর বন্ধুর ছবিতে।

চলচ্চিত্রের সম্পাদনা একটা খুব গুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল কাজ। শুটিং শেষ হলে সম্পাদকের কাজ শু হয় এবং ছবির চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্মান সম্পূর্ন নির্ভর করে সম্পাদনার ওপরেই। পথের পাঁচালি থেকে শেষ ছবি আগন্তুক পর্যন্ত সত্যজিতের সমস্ত ছবির সম্পাদক ছিলেন দুলাল দত্ত। ব্যক্তিগত জীবনে পঙ্কজ মল্লিকের নাতি, বহুবিদ্যাবিশারদ, এই লোকটি খুব অল্প বয়সেই সিনেমাশিল্পে এসেছিলেন। সত্যেন বসুর কোনো ছবিতে যখন তিনি সহকারী সম্পাদকের কাজ করছেন তখন বংশী চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে সত্যজিতের কাছে নিয়ে এলেন। আমাকে বললেন --- "দুলাল, আমার বিশেষ বন্ধু, একজন শিল্পী, পথের পঁ াচালি বলে একটা নূতন ধরনের ছবি তৈরি করছেন। তুমি কি এ ছবিতে কাজ করবে?" (সুব্রত মিত্র, বংশী চন্দ্রগুপ্ত ও দুল াল দত্ত বিষয়ক তথ্যসূত্র --- সিনেমায় পথের পাঁচালির পাঁচ দশক অমিয় সান্যাল।)

কলাকুশলীদের মত অভিনেতারাও ছিল নতুন। প্রতিষ্ঠিত ও পাকা অভিনয়শিল্পী নিয়ে কাজ করার ঝুঁকি কম, তাঁদের শেখ ানোও সহজ, কিন্তু তাঁদের নিয়ে একটা বড় অসুবিধাও আছে। তা হল তাঁদের পরিচিত ভাবমূর্তির তলায় গল্পের চরিত্রটি অনেক সময় ঢাকা পড়ে যায়। সেজন্য সত্যজিৎ রায়, নিতান্ত নিপায় না হলে, নতুন ছবির জন্য নতুন মুখ খুঁজতেন। কণা বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন গ্রুপ থিয়েটার থেকে। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ফিল্মে অভিনয় করলেও বিখ্যাত ছিলেন না আদৌ। অপু ও দুর্গা তো একেবারেই আনকোরা। সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন ইন্দির ঠাকণ। থিয়েটারের বিস্মৃত অতীত থেকে সত্যজিৎ যেভাবে এঁকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তা খানিকটা ভাগ্যও বটে। আবার দরকার হলে তিনি তুলসি চক্রবর্তীর মত বিখ্যাত অভিনেতাকে অপ্রধান ভূমিকাতে নামিয়েছেন। আসলে এখানেও কাজ করেছে তাঁর লোক চেনবার ক্ষমতা ও শেখানোর পদ্ধতি। ছোট বড় প্রত্যেকের কাছ থেকে তিনি বার করে এনেছেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাজটুকু।
এইরকম টিমওয়ার্কের ভিতর দিয়েই রচিত হয়েছিল পথের পাঁচালির ফিল্ম।
আজ ভাবতে ভালো লাগে যে আশি বছর আগে ভাগলপুরের জঙ্গলে বসে বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় আর ষাট বছরআ াগের কলকাতায় বসে সত্যজিৎ রায় যে যে কাজ হাত দিয়েছিলেন সেগুলি ছিল তাঁদের দুজনেরই প্রথম বড় কাজ। দু

জনের কাজই বিখ্যাত হয়েছিল, এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। দুজনের বয়সও তখন মোটামুটি একই রকম ছিল। এই কাজ তাঁদের জীবনে কতখানি গুত্বপূর্ন হবে তা ভালো করে কেউই হয়ত বোঝেন নি, কিন্তু অস্পষ্ট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দু দু বক্ষে দুজনেই অপেক্ষা করেছিলেন, জীবনের সিংহদ্বারের পাশে দাঁড়ানো দুই যুবক । কেবল একজনের মাধ্যম কালিকলম, আর অন্যজনের ক্যামেরা, আর মধ্যে এক প্রজন্মের ব্যবধান।